Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501077 OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75 SJIF Impact Factor 3.481

The Splendor of Biodiversity in the Ancient Tamil Poetry 'Kuruntokai'

প্রাচীন তামিল কাব্য 'কুড়ুন্দোগৈ'এ জীববৈচিত্র্যের সুষমা

Bikash Mandi Research Associate & Dr. Senthil Prakash Selkutti Associate Professor
Tamil Department
Visva-Bharati

Received on: 02nd June 2026
Accepted on: 12th June 2026

Abstract:

The ancient Tamil Sangam anthology, 'Kuruntokai', seamlessly intertwines the deep human emotions of love and separation with the vivid beauty of natural biodiversity. The ecological foundation of this poetry rests on the concept of 'Thinai', which categorizes the landscape into five distinct physiographic zones: mountainous, pastoral, agricultural, coastal, and arid. Each ecosystem features specific flora and fauna that serve as precise psychological metaphors for human emotional states. The poets demonstrated an extraordinary understanding of behavioral ecology. For instance, the Kurinji flower, blooming once every twelve years, symbolizes rare and profound love. Similarly, the touching depiction of a male elephant prioritizing his mate's thirst during a drought mirrors human marital devotion, while the predatory precision of a kingfisher reflects societal scrutiny.

In Kuruntokai, nature is never a mere passive backdrop; it functions as a living character and an active participant in human joy and sorrow. Viewed through the lens of modern Ecocriticism, this two-thousand-year-old masterpiece remains a profound environmental testament. It reminds us that humanity is not the master of nature, but an inseparable part of this grand, interconnected biodiversity.

Key Words:
Kuruntokai, Thinai, Biodiversity, Ecosystem, Ethology, Ecocriticism.

মূল প্রবন্ধ

সঙ্গাম সাহিত্য ও 'কুড়ুন্দোগৈ'এর পটভূমি

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে দক্ষিণ ভারতের সঙ্গাম সাহিত্য এক অনন্য এবং ভাস্বর মাইলস্টোন। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টীয় ৩০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়ে মাদুরাই শহরের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সাহিত্য রচনা ও আলোচনাকেন্দ্রিক তিনটি

© Santiniketan Sahityapath

প্রধান সাহিত্য সম্মেলন বা ‘সঙ্গাম’ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়কে তামিল সাহিত্যে সঙ্গাম যুগ বলা হয়। এই সঙ্গাম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এবং জনপ্রিয় সংকলন হলো ‘কুড়ুন্দোগৈ’। এটি মূলত সঙ্গাম সাহিত্যের ‘এট্টুত্তোকাই’ বা ‘আটটি কাব্য সংকলন’এর অন্তর্গত। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হলো ‘সংক্ষিপ্ত কবিতার সংকলন’। এতে মোট ৪০১টি ছোটো ছোটো কবিতা রয়েছে। কাব্যের কবিতাগুলির লাইন সংখ্যা চার থেকে আট লাইনের মধ্যে সীমাবন্ধ হলেও এর বৈচিত্র্য বহুমাত্রিক। কবিতাগুলি তৎকালীন সময়ের প্রায় ২০৫ জন ভিন্ন ভিন্ন কবি দ্বারা রচিত হয়েছিল।

‘কুড়ুন্দোগৈ’এর মূল উপজীব্য বিষয় হলো ‘আকম’ (Akam) বা মানুষের অভ্যন্তরীণ অনুভূতি, বিশেষ করে প্রেম, মিলন, বিরহ, মান-অভিমান এবং দাম্পত্য জীবন। এই কাব্যের সবচেয়ে বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষের এই তীব্র মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতিগুলি প্রকাশ করার জন্য কবিরা কোনো কৃত্রিম অলংকার বা বিমূর্ত অবয়ব বা দর্শনের আশ্রয় নেননি। বরং তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন তাঁদের চারপাশের চেনা প্রকৃতি, উদ্ভিদজগৎ এবং প্রাণিকুলকে। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার বছর আগে দাক্ষিণাত্যের বুকে যে সমৃদ্ধ পরিবেশ ও অক্ষত বাস্তুতন্ত্র ছিল, ‘কুড়ুন্দোগৈ’ তারই এক জীবন্ত, প্রামাণ্য এবং শৈল্পিক দলিল। এই সংকলনের বিভিন্ন কবিতায় প্রায় ৮৭ প্রকার উদ্ভিদ, ২৮ প্রকার পশু ও ২২ প্রকার পাখির উল্লেখ পাওয়া যায়। কাব্যে জীববৈচিত্র্য কেবল মানুষের সুখ-দুঃখের পটভূমি বা ব্যাকগ্রাউন্ড হিসেবে আসেনি; প্রকৃতি এখানে অন্যতম প্রধান চরিত্র যা মানুষের অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে স্পন্দিত হয়েছে।

সঙ্গাম কাব্যের পরিবেশতাত্ত্বিক ভিত্তি: ‘থিনাই’(Thinai)

‘কুড়ুন্দোগৈ’এর জীববৈচিত্র্যকে বুঝতে হলে সঙ্গাম সাহিত্যের মূল ভিত্তি ‘থিনাই’ (Thinai) বা ভৌগোলিক বিন্যাসের ধারণাটি বোঝা অপরিহার্য। প্রাচীন তামিল কবিরা তাঁদের চেনা পৃথিবীকে পাঁচটি নির্দিষ্ট প্রাকৃতিক ও বাস্তুসংস্থানিক অঞ্চলে (Physiographic Zones) ভাগ করেছিলেন। প্রতিটি অঞ্চলের নির্দিষ্ট মাটি, জলবায়ু, উদ্ভিদ এবং প্রাণিকুল ছিল যা মানুষের নির্দিষ্ট এক একটি মানসিক অবস্থার (Psychological States) প্রতীক হিসেবে কাজ করত। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ কাব্যে এই পাঁচটি ‘থিনাই’এর জীববৈচিত্র্য যেভাবে ফুটে উঠেছে এবং প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে তা নিচে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

সঙ্গাম বাস্তুতন্ত্র:

প্রাকৃতিক অঞ্চল	প্রাকৃতিক উপাদান বা সংকেত	সংশ্লিষ্ট আবেগ বা অনুভূতি
কুরিঞ্জি (পার্বত্য অঞ্চল)	হাতি, ময়ূর, চন্দন গাছ, কুরিঞ্জি ফুল, কাঁঠাল	মিলন ও আদিম প্রেম
মুল্লাই (অরণ্য ও চারণভূমি)	হরিণ, মুল্লাই বা জুঁই ফুল, গরু, খরগোশ	ধৈর্য ও প্রতীক্ষা
মরুদম (কৃষিপ্রধান সমভূমি)	জারুল, অর্জুন, হাঁস, মাছ, মাছরাঙা	প্রণয়-কলহ ও অভিমান
নেইদাল (উপকূলীয় অঞ্চল)	গাঙচিল, হাঙর, শালুক, পুন্নাই	গভীর বিরহ ও বেদনা
পালাই (শুষ্ক মরু অঞ্চল)	গিরগিটি, বাজপাখি, শকুন, ক্যাকটাস, বাবলা	দীর্ঘ বিচ্ছেদ ও বিপজ্জনক যাত্রা

১. কুরিঞ্জি (Kurinji) — পার্বত্য বাস্তুতন্ত্র

কুরিঞ্জি বলতে বোঝায় ঘন অরণ্যে ঘেরা পাহাড়ি অঞ্চল। ‘কুড়ুন্দোগৈ’এ এই অঞ্চলটি প্রেমিকের মিলন এবং গোপন অভিসারের প্রতীক। বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেমিক-প্রেমিকার মিলনই হলো এই অঞ্চলের মূল অনুভূতি।

উদ্ভিদবৈচিত্র্য: এই অঞ্চলের প্রধান আকর্ষণ হলো নীল-বেগুনি রঙের ‘কুরিঞ্জি’ ফুল (Strobilanthes kunthiana), যা দীর্ঘ ১২ বছরে মাত্র একবার পাহাড়ের ঢাল সংলগ্ন বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে ফোটে। কবিরা এই ফুলের ফোটাকে মানুষের জীবনে গভীর ও দুর্লভ প্রেমের আগমনের সঙ্গে তুলনা করেছেন বা সাদৃশ্য অনুভব করেছেন। এ ছাড়া পাহাড়ি ঢালে সুগন্ধি চন্দন গাছ, বিশাল বাঁশঝাড়, বুনো আদা, এবং কাঁঠাল প্রভৃতি গাছ এই অঞ্চলের আদিম নিবিড়তাকে ফুটিয়ে তোলে।

© Santiniketan Sahityapath

বিকাশ মান্ডি ও ড. সেন্থিল প্রকাশ. সেলকুট্টি

প্রাণিবৈচিত্র্য: কুরিঞ্জি অঞ্চলের প্রধান প্রাণিরা হলো বুনো হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, এবং গাছের ডালে চঞ্চল কালোমুখো বানর (Langur)। গভীর রাতে পাহাড়ের গুহা থেকে বাঘের গর্জন বা হাতির ডাক বিবাহ পূর্ববর্তী প্রেমিক-প্রেমিকার গোপন মিলনের তীব্রতাকে আরো রোমাঞ্চকর করে তোলে।

২. মুল্লাই (Mullai) — চারণভূমি ও অরণ্য বাস্তুতন্ত্র

মুল্লাই হলো মূলত বনভূমি এবং পশুপালনের উপযুক্ত চারণভূমি। এটি ঘরের স্ত্রী বা প্রেমিকার ধৈর্যের সাথে স্বামীর বা প্রেমিকের ফিরে আসার প্রতীক্ষার প্রতীক।

উদ্ভিদবৈচিত্র্য: বর্ষার শুরুতে এই অঞ্চলে শুভ্র, সুগন্ধি 'মুল্লাই' (এক ধরনের বুনো জুঁই) ফুল ফোটে। 'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবিতায় দেখা যায়, এই বুনো জুঁইয়ের কুঁড়ি ফোটার বিষয়টি দূরে বা প্রবাসে থাকা স্বামীকে মনে করিয়ে দেয় যে, বর্ষা এসে গেছে এবং এবার ঘরে ফেরার সময় হয়েছে।

প্রাণিবৈচিত্র্য: এখানে বিচরণ করে চঞ্চল হরিণ, বুনো খরগোশ এবং ঘরের গৃহপালিত গরু ও ছাগল। সন্ধ্যায় গোধূলিলগ্নে চারণভূমি থেকে যখন গরুর পাল ধুলো উড়িয়ে গোয়ালে ফেরে, তখন পাখির দলও বাসায় ফেরে — এই দৃশ্যটি মানুষের মনেও ঘরে ফেরার এক আকুল তৃষ্ণা তৈরি করে।

৩. মরুদম (Marutham) — কৃষিপ্রধান সমভূমি বাস্তুতন্ত্র

নদীমাতৃক উর্বর কৃষিজমি এবং মানুষের লোকাল নিয়ে মরুদম অঞ্চল গঠিত। এটি দাম্পত্য জীবনে নায়কের পরকীয়া বা নায়িকার অভিমান ও প্রণয়-কলহের (Infidelity and Sulking) পটভূমি।

উদ্ভিদবৈচিত্র্য: নদীর তীরে ফুটে থাকা লাল ও বেগুনি রঙের 'মরুদম' (জারুল বা অর্জুন জাতীয় গাছ), জলের বুকে পদ্ম, শালুক এবং মাঠে মাঠে সোনাঝরা ধানের খেত এই অঞ্চলের সমৃদ্ধির প্রতীক।

প্রাণিবৈচিত্র্য: জলাশয়ে সাঁতার কাটা হাঁস, মাছ শিকারি মাছরাঙা পাখি, এবং কাদার মধ্যে শান্তভাবে বসে থাকা মহিষ এই অঞ্চলের প্রধান প্রাণি। মাছরাঙা পাখি যেভাবে ওত পেতে মাছ ধরে, কবিরা তাকে রূপক হিসেবে ব্যবহার করে নায়কের গোপনে অন্য নারীর কাছে যাওয়ার চতুরতাকে ব্যঞ্জা করেছেন।

৪. নেইদাল (Neithal) — উপকূলীয় বাস্তুতন্ত্র

সমুদ্রের তীরবর্তী বালিয়াড়ি এবং লবণাক্ত জলাশয় সংলগ্ন পরিবেশ হলো নেইদাল। এটি মূলত নায়কের জন্য নায়িকার গভীর বিরহ এবং কান্নার প্রতীক, যা সমুদ্রের অন্তহীন তরঙ্গের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্ভিদবৈচিত্র্য: নোনা বাতাসে দুলতে থাকা কেয়া গাছ (Pandanus), সাদা ফুলবিশিষ্ট পুন্নাই গাছ এবং বালির ওপরে ফুটে থাকা নীল রঙের 'নেইদাল' (জলপদ্ম সদৃশ ফুল) এই অঞ্চলের প্রধান উদ্ভিদ। কেয়া ফুলের তীব্র সুগন্ধ এবং তার কাঁটা বিরহের তীব্র জ্বালাকে প্রকাশ করে।

প্রাণিবৈচিত্র্য: আকাশে উড়তে থাকা সাদা গাঙচিল, সমুদ্রের মাছ, তীরের বালিতে গর্ত করে থাকা কাঁকড়া এবং মাছের গন্ধ পেয়ে ছুটে আসা বুনো সারস এই অঞ্চলের প্রধান প্রাণিসমূহ।

৫. পালাই (Palai) — শুষ্ক ও মরু বাস্তুতন্ত্র

গ্রীষ্মের তীব্র দাবদাহে যখন কুরিঞ্জি বা মুল্লাই অঞ্চল শুকিয়ে যায়, তখন তা পালাই বা মরু অঞ্চলের রূপ নেয়। এটি জীবিকার সন্ধানে নায়কের দূরদেশে বিপজ্জনক যাত্রা এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের প্রতীক।

উদ্ভিদবৈচিত্র্য: জলহীন শুকনো মাটিতে বেঁচে থাকা কাঁটাঝোপ, পাতাঝরা ক্যাকটাস, এবং ছায়াহীন কালো বাবলা গাছ। এখানে উদ্ভিদের জীবন প্রায় স্তব্ধ।

© Santiniketan Sahityapath

প্রাণিবৈচিত্র্য: তীব্র তৃষ্ণায় ছটফট করা গিরগিটি, আকাশে ওড়া শিকারি বাজপাখি ও শকুন, এবং ক্ষুধার্ত বুনো কুকুর বা নেকড়ে। এই ভয়ংকর পরিবেশ নায়কের যাত্রাপথের কঠিন বাস্তবতাকে তুলে ধরে।

'কুড়ুন্দোগৈ'এর উদ্ভিদজগৎ: রূপক ও বাস্তবের মেলবন্ধন

'কুড়ুন্দোগৈ'এর কবিরা কেবল উদ্ভিদের নাম উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং প্রতিটি উদ্ভিদের গঠন, ফুলের রঙ, ফোটার ঋতু এবং সুবাসকে অত্যন্ত নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। উদ্ভিদজগৎ কাব্যের কবিতাগুলিতে মানুষের অনুভূতির পরিপূরক হিসেবে কাজ করেছে।

১. ফুলের রঙ ও বিরহের তীব্রতা:

সঙ্গাম যুগে ফুল কেবল সৌন্দর্যের প্রতীক ছিল না, এটি ছিল অন্তর মনের ভাব ও ভাষার বিকল্প। 'কুড়ুন্দোগৈ'এর একটি কবিতায় (কবিতা নম্বর: ৩৪৩) কবি বর্ণনা করছেন কীভাবে প্রিয়তমার চোখের কোণের অশ্রু এবং লালচে ভাব ভেঙ্গৈ বা রুদ্রপলাশ ফুলের কুঁড়ির মতো দেখায়। আবার বিরহিনী নায়িকার গায়ের রঙ যখন উদ্বেগে বিবর্ণ, ফ্যাকাসে বা হলোদেটে হয়ে যায়, কবিরা তাকে তুলনা করেন 'পসলৈ' বা হলুদের আভার সঙ্গে।

২. উদ্ভিদের প্রতীকী রূপ:

কুরিঞ্জি ফুল দুর্লভ ও গভীর প্রেম (১২ বছরে একবার ফোটে), মুল্লাই ফুল বর্ষার আগমন ও প্রতীক্ষার অবসান, কেয়া ফুল কাঁটাযুক্ত বিরহের তীব্র জ্বালা, কাঁঠাল গাছ আশ্রয়, নিরাপত্তা ও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক।

৩. কাঁঠাল গাছ ও প্রেমের পরিপক্বতা:

কুরিঞ্জি অঞ্চলের অন্যতম প্রধান উদ্ভিদ হলো কাঁঠাল গাছ। 'কুড়ুন্দোগৈ'এর ১৮ নম্বর কবিতায় কপিলর (Kapilar) নামক বিখ্যাত কবি নায়িকার সখীর জবানিতে লিখছেন:

O man of sloping hills,
where the sweetest jackfruit grows
by the root of the tree,
fenced in by young bamboo:
be kind to her!
Who knows what a state she is in?
Like a huge fruit
Hanging
from a tiny stem
on the hillside,
her life is so frail,
and her love so very great.

এখানে কাঁঠাল গাছের বিশালত্ব এবং তার ফল বা মধুর পরিপক্বতা আসলে নায়ক-নায়িকার প্রেমের স্থায়িত্ব ও গভীরতাকেই নির্দেশ করে। গাছটি এখানে কেবল কাঠ বা ফলের উৎস নয়, তা তাদের অন্তরঙ্গ প্রেমের এক নীরব সাক্ষী।

প্রাণিকুলের চিত্রায়ণ: আচরণগত বাস্তুসংস্থান (Behavioral Ecology)

'কুড়ুন্দোগৈ' কাব্যের সবচেয়ে আধুনিক দিকটি হলো এর কবিদের অসাধারণ প্রাণি-পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। জীববিজ্ঞানের পরিভাষায় যাকে 'Ethology' বা প্রাণির আচরণবিদ্যা বলা হয়, তার চমৎকার প্রয়োগ দেখা যায় কবিতার ছত্রে। কবিরা বন্য প্রাণিদের পারিবারিক ও সামাজিক আচরণকে মানুষের সামনে আদর্শ হিসেবে তুলে ধরেছেন।

১. হাতির দাম্পত্য ও বাৎসল্য প্রেম:

'কুড়ুন্দোগৈ'এ হাতির উল্লেখ সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। বুনো হাতির শক্তি যেমন একদিকে ভয়ের উদ্রেক করে, তেমনি তাদের

© Santiniketan Sahityapath

পারস্পরিক প্রেম মানুষকে শিক্ষা দেয়। ৩৭ নম্বর কবিতায় চিত্রিত হয়েছে এক চরম খরা পরিস্থিতির দৃশ্য:

Friend!
Our lover has great love for you;
I am sure he will never fail
To shower his grace on you
Because, the path he treads through
Is of such love! Here, a huge-trunked tusker
Pulls down the soft branches
Of a ya tree to appease
The hunger of its loving mate!
(The confidante consoles the heroine saying, "our lover will return eft soon!")

প্রখর সূর্য মাথার ওপরে, চারদিকের মাটি ফেটে চৌচির। একটি পুরুষ হাতি এবং তার সঙ্গিনী হস্তিনী বনের মধ্যে জলের সন্ধানে ঘুরছে। কোথাও জল না পেয়ে, পুরুষ হাতিটি তার শুঁড় দিয়ে একটি শুকনো বাঁশগাছের নরম ছাল উপড়ে ফেলল। সেই ছাল থেকে যে সামান্য মিষ্টি রস বের হলো, পুরুষ হাতিটি নিজে এক ফোঁটাও না খেয়ে, পরম মমতায় তা প্রথমে তার তৃষ্ণার্ত সঙ্গিনীর মুখে তুলে দিল।

এই দৃশ্যটি দেখার পর নায়িকার সখী নায়ককে উদ্দেশ্য করে বলছেন যে, বনের পশুপাখিরাও যদি সঙ্গিনীর প্রতি এত যত্নশীল হতে পারে, তবে তুমি কেন তোমার প্রিয়তমাকে ফেলে দূরে চলে যাচ্ছ? বন্য হাতির এই আচরণ মানুষের দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

২. বানরদের পারিবারিক জীবন:

কুরিঞ্জি বা পাহাড়ি অঞ্চলের কবিরা বানরদের প্রাত্যহিক জীবনকে খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। একটি কবিতায় দেখা যায়, পাহাড়ের চূড়ায় মেঘ ডাকছে এবং বৃষ্টি শুরু হতে চলেছে। এমন সময় একটি মা-বানর (Macaque) তার ছোটো বাচ্চাটিকে বুকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফিয়ে আশ্রয় খুঁজছে, আর পুরুষ বানরটি চারপাশের পরিবেশ পাহারা দিচ্ছে যাতে কোনো শিকারি পাখি বা পশু আক্রমণ করতে না পারে। বানরদের এই মানবিক পারিবারিক রূপটি সঙ্গাম কবিদের সংবেদনশীল মনের পরিচয় দেয়।

৩. পাখির কলতান ও সময়ের পরিমাপ:

ঘড়ির আবিষ্কারের বহু আগে, সঙ্গাম যুগের মানুষ প্রকৃতির নিজস্ব ঘড়ির ওপর নির্ভর করত। 'কুড়ুন্দোগৈ'এ পাখিদের ডাককে সময়ের নির্দেশক হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। সকালবেলা জলাশয়ের ধারে সাদা সারসের ডানা ঝাপটানো বা বুনো কাকের ডাক মানেই হলো ভোরের আগমন এবং কর্মজীবনের শুরু। গভীর রাতে পেঁচার গম্ভীর 'হুত-হুত' শব্দ নির্জনতা এবং বিরহের অন্ধকারকে আরো ঘনীভূত করে তোলে। নায়িকা যখন একাকী ঘরে বসে থাকে, তখন রাতের পেঁচার ডাক তার বুকের ভেতর ভয় ও একাকিত্বের নির্জনতা গ্রাস করে।

'কুড়ুন্দোগৈ'এর বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য ও খাদ্যশৃঙ্খল (Food Chain)

'কুড়ুন্দোগৈ' কেবল রোমান্টিক প্রকৃতির বর্ণনা নয়, এতে প্রকৃতির নির্মম সত্য এবং খাদ্যশৃঙ্খলের (Food Chain) বাস্তব চিত্রও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। কবিরা জানতেন যে, প্রকৃতিতে জীবন এবং মৃত্যু পারস্পরিক হাত ধরাধরি করে চলে।

শিকার ও শিকারির সম্পর্ক: কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় বাঘ এবং হরিণের সম্পর্ক, কিংবা সাপ এবং ময়ূরের দ্বন্দ্বের কথা এসেছে। একটি কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে কীভাবে একটি ময়ূর বনের ঘাসের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বিষাক্ত সাপকে তার ধারালো ঠোঁট দিয়ে আঘাত করছে। এখানে ময়ূরের সৌন্দর্য যেমন আছে, তেমনি তার শিকারি রূপটিও স্পষ্ট।

অন্য একটি কবিতায় দেখা যায়, পাহাড়ের স্রোতস্বিনী নদীর জলে একটি মাছরাঙা পাখি (Kingfisher) একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। জলে একটি ছোটো মাছ ভেসে উঠতেই সে তীরের গতিতে নেমে এসে মাছটিকে ঠোঁটে পুরে নিল। কবিরা এই দৃশ্যটি ব্যবহার

করেছেন সমাজকে বোঝাতে — যেভাবে মাছরাঙা সুযোগের অপেক্ষায় থাকে, তেমনি সমাজও মানুষের সামান্যতম ত্রুটি বা পরকীয়া প্রেমকে লুফে নেওয়ার জন্য ওত পেতে বসে থাকে।

আধুনিক পরিবেশবিদ্যার (Ecocriticism) আলোকে ‘কুড়ুন্দোগৈ’

আজকের একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যখন আমরা জলবায়ু পরিবর্তন, বনাঞ্চল ধ্বংস এবং জীববৈচিত্র্যের সংকটের মুখোমুখি, তখন ‘কুড়ুন্দোগৈ’এর মতো দুই হাজার বছরের প্রাচীন কাব্য আমাদের নতুন করে পথ দেখাতে পারে। সাহিত্যের আধুনিক সমালোচনা পদ্ধতিতে একে বলা হয় ‘ইকোক্রিটিসিজম’ (Ecocriticism) বা পরিবেশবাদী সাহিত্য সমালোচনা।

‘কুড়ুন্দোগৈ’ আমাদের শেখায় যে, মানুষ প্রকৃতির চেয়ে আলাদা বা শ্রেষ্ঠ কোনো জীব নয়। সঙ্গম সংস্কৃতির মানুষ বিশ্বাস করত যে, মানুষের অস্তিত্ব প্রকৃতির সুস্থতার ওপর নির্ভরশীল। তাই তাঁরা যখনি কোনো মানবিক অনুভূতির কথা বলেছেন, তার সঙ্গে একটি গাছ, একটি ফুল বা একটি পশুর জীবনকে জড়িয়ে দিয়েছেন। ‘কুড়ুন্দোগৈ’এর কবিরা বনের পশুপাখিকে ‘অন্য’ (The Other) ভাবেননি। বনের হাতি বা হরিণকে তাঁরা পরিবারের সদস্যের মতোই মর্যাদা দিয়েছেন। পাঁচটি ‘থিনাই’ বা প্রাকৃতিক অঞ্চলের মানুষ তাদের নিজেদের অঞ্চলের পরিবেশকে রক্ষা করে চলত। পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ শিকার করলেও বনের বাস্তুতন্ত্র নষ্ট করত না। উপকূলের জেলেরা মাছ ধরলেও সমুদ্রের ভারসাম্য বজায় রাখত।

‘কুড়ুন্দোগৈ’এর চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা

প্রাচীন তামিল কাব্য ‘কুড়ুন্দোগৈ’ কেবলই কিছু প্রেমের কবিতার সংকলন নয়, এটি হলো মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির আদিম, নিবিড় এবং পবিত্র সম্পর্কের এক মহাকাব্য। এর ৪০১টি কবিতার অধিকাংশ কবিতায় যে জীববৈচিত্র্যের সুষমা ছড়িয়ে রয়েছে, তা একাধারে চোখকে জুড়িয়ে দেয় এবং মনকে এক গভীর আত্মোপলব্ধির দিকে নিয়ে যায়।

কবি কপিলর, ওলাইয়াড় বা পেরুনকাদুঙ্কো-র মতো প্রাচীন দ্রষ্টা কবিরা প্রকৃতির ক্যানভাসে মানুষের জীবনচিত্রকে এঁকেছিলেন। সেখানে একটি ছোটো পাখির বাসা বোনা, মৌমাছির মধু সংগ্রহ, বা বর্ষার প্রথম বৃষ্টিতে কুরিঞ্জি ফুলের ফুটে ওঠার ঘটনাও মানুষের হৃদয়ের গোপনতম অনুভূতির কথাকে ফুটিয়ে তোলে। ‘কুড়ুন্দোগৈ’ আজ আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চরম উৎকর্ষের যুগেও যদি আমরা আমাদের চারপাশের জীববৈচিত্র্যকে রক্ষা করতে না পারি, তবে মানুষের ভেতরের মানবিক অনুভূতি ও ভালোবাসার সুষমাও একদিন এই পৃথিবীর বুক থেকে ক্রমশ হারিয়ে যাবে। তাই ‘কুড়ুন্দোগৈ’এর কাব্যিক ভাবনায় জীববৈচিত্র্যের সুষমা, পরিবেশচেতনা আজ দুই হাজার বছর পরেও সমসাময়িক এবং অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে।

সহায়ক গ্রন্থ:

১। সুব্রমনিয়ম কৃষ্ণমূর্তি, ‘কুরুন্তোকাই’ (বাংলা অনুবাদ), সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, নতুন দিল্লি ১১০০০১, প্রথম প্রকাশ ২০১৫

২। Govindaswamy Rajagopal, CULTURAL POETICS AND SANGAM POETRY, Sun International Publishers, PG-105, Possangipur, Janakpuri, New Delhi-110058, 2016

৩। Jayanthasri Balakrishnan, KURUNTOKAI (Text, Transliteration and Translation in English Verse and Prose), CENTRAL INSTITUTE OF CLASSICAL TAMIL, Chennai, First Published 2013

৪। M. Varadarajan, THE TREATMENT OF NATURE IN SANGAM LITERATURE (Ancient Tamil Literature), The South India Saiva Siddhanta Works Publishing Society, Tinnevelly, Madras, May 1957

—

© Santiniketan Sahityapath